পর্যায় — ৩

একক ১(ক) ❑ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সামাজিক উৎস

গঠন

১(ক).০ উদ্দেশ্য

১(ক).১ প্রস্তাবনা

১(ক).২ জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১(ক).৩ ব্রিটিশ বিরোধিতার উৎস সন্ধানে

১(ক).৩.১ কৃষক শ্রেণীর ক্ষোভ

১(ক).৩.২ রাজা, মহারাজা ও জমিদারদের ক্ষোভ

১(ক).৩.৩ পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষোভ

১(ক).৩.৪ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষোভ

১(ক).৩.৫ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষোভ

১(ক).৪ রাজনৈতিক সংগঠনের সূত্রপাত

১(ক).৪.১ বাংলায় রাজনৈতিক সংগঠন

১(ক).৪.২ পশ্চিম ভারতের (বোম্বাই প্রেসিডেন্সি) রাজনৈতিক সংগঠন

১(ক).৪.৩ দক্ষিণ ভারতের (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি) রাজনৈতিক সংগঠন

১(ক).৫ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা— তর্ক বিতর্ক

১(ক).৫.১ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেরণা ও উদ্যোগ

১(ক).৫.২ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কারণ ও উদ্দেশ্য

১(ক).৫.৩ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব

১(ক).৬ কংগ্রেসের সামাজিক ভিত্তি

১(ক).৭ সারাংশ

১(ক).৮ অনুশীলনী

১(ক).৯ গ্রন্থপঞ্জী

১(ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

১. জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রে(াপট
২. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মৌলিক সূত্র
৩. রাজনৈতিক সংগঠনের সূত্রপাত
৪. জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—তর্ক ও বিতর্ক
৫. জাতীয় কংগ্রেসের সামাজিক ভিত্তি

১(ক).১ প্রস্তাবনা

১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের প্রবল উন্মাদনা ও উত্তেজনা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গেলেও এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসক ভারতবাসীর (োভ ও অসন্তোষ সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য শাসনকার্যে ভারতীয়দের সংযুক্ত(করার নীতি— যাকে আমরা "Policy of association" বলি— গ্রহণ করলেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবের অবসান ঘটে নি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিবাদী আন্দোলন কোন পথ ও পদ্ধতিতে এবং সর্বোপরি কোন প্রাতিষ্ঠানিক ছত্রছায়ায় গড়ে তোলা যায়, তা নিয়ে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তখনই পাওয়া যায় নি। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এই অভাব পূর্ণ করে। এই প্রথম এমন একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়, যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চালিকা শক্তি(রূপে দ(ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে স(ম হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। মহাবিদ্রোহের পর থেকেই এই ধরনের একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। কাজেই প্রথমে আমরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রে(াপট বি(-ষণ করার চেষ্টা করবো। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানই বিনা কারণে গড়ে ওঠে না। আমরা জানি মানুষ নিজের তাগিদে তখনই একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, যখন কিছু সমমনস্ক ব্যক্তি(নিজেদের (োভ ও অসন্তোষের প্রতিকারকল্পে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচী সামনে রেখে সমবেত হয়। সুতরাং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রে(াপট অনুধাবন করতে হলে, আমাদের এই দিকটি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে। অন্যদিকে কংগ্রেসের জন্মরহস্য ঐতিহাসিকদের কেবলমাত্র কৌতূহল ও আগ্রহেরই সৃষ্টি করে নি, কংগ্রেসের প্রকৃত স্থাপয়িতা কে বা কারা তা নিয়ে এক তীব্র বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে। কাজেই এ বিষয়েও আমাদের আলোকপাত করতে হবে। সবশেষে কংগ্রেস প্রকৃতই একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল কিনা ভারতের সর্বশ্রেণী ও স্তরের মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত(ছিল কিনা, তা নিয়েও প্র(উঠেছে। আলোচ্য এককে আমরা এই প্রসঙ্গেও আলোচনা করবো। কংগ্রেসের সামাজিক ভিত্তি বি(-ষণ করে আমরা দেখাতে চেষ্টা করে আমরা দেখাতে চেষ্টা করবো যে, কংগ্রেসের আদি যুগে

এই প্রতিষ্ঠান ছিল মূলতঃ সমাজের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ শি(ত উপরতলার একটি সংগঠন। সাধারণ অশি(ত মানুষের সংযোগ রহিত এই প্রতিষ্ঠান তাই এই সময়ে তৃণমূল স্পর্শ করতে পারে নি। মনে রাখবেন শুধু কংগ্রেসের উদ্ভবই নয়, তার সংগঠন, কর্মপদ্ধতি, আন্দোলনের ল(, নেতৃত্বের লড়াই ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ই অত্যন্ত বিতর্কিত এবং এই সম্পর্কে কোন সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। সুতরাং যুক্তি(, তর্ক ও বি(-ষণের মাধ্যমে আপনি নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

১(ক).২ জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রারম্ভিক কাজটুকু করেছিল। এরপর একশ বছর ধরে ভারতে মূলত মহীশূর, মারাঠা ও শিখদের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করে তবেই ইংরেজরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশাল ইমারত গড়ে তুলতে স(ম হয়েছিল। কিন্তু তখনও তাদের ভারত বিজয় অমস্পূর্ণ ছিল। অসংখ্য দেশীয় রাজ্য তখনও তাদের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা অ(ণ্ণ রাখতে স(ম হয়েছিল। অন্য দিকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ কোনদিনই মসৃণ ছিল না। সাম্রাজ্য গঠনের কাজ শু(হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধিতা ও বিদ্রোহের মুখে পড়তে হয়েছিল ইংরেজদের। যেহেতু বাংলাদেশেই প্রথম রচিত হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি, স্বাভাবিক কারণেই তাই এখানকার সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রথম গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ায় বিদ্রোহের পরিধি প্রসারিত হয় এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও একের পর এক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এই সব বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব নীতি, যা একই সঙ্গে জমিদার-তালুকদার ও কৃষক উভয়েরই স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। ভূমিরাজস্বের ত্র(মবর্ধমান চাপ তাদের প(ত্র(মশ দুর্বহ হয়ে পড়ছিল এবং কৃষকেরা দেনার দায়ে তাদের জমিজমা হারাচ্ছিল। ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস বাংলায় চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তন করে অবশ্য জমিদার শ্রেণীকে কিছুটা বশে আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যাই হোক অষ্টাদশ শতক ও ঊনবিংশ শতকে একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ ইংরেজদের গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র উর্বর সমতলভূমিতে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলমান জমিদার ও কৃষকরাই এই সব বিদ্রোহে অংশ নেয় নি(সুদূর এবং দুর্গম পার্বত্য ও মালভূমির অরণ্য অঞ্চলের আদিবাসীরাও এই সব আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তারা গভীর উদ্বেগ ও বেদনার সঙ্গে ল(করেছিল কি ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের লালিত্ব ও সযত্নে পোষিত গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থা দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছিল।

ব্রিটিশ আমলের প্রথম একশো বছরের মধ্যে বাংলায় যে সব কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ হয়েছিল, সেগুলির সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছাড়াও মেদিনীপুরের চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৬-৮৩), পার্বত্য চট্টগ্রামে চাক্‌মা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), মেদিনীপুরের

নায়ক বিদ্রোহ (১৮০৬-১৬), ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৫-২৭), ওয়াহাবী ও তিতুমীর বিদ্রোহ (১৮৩১), কোল বিদ্রোহ (১৮৩১), ফরাজী বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৮), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) ও নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাইরে যে সব বিদ্রোহ হয়েছিল তার মধ্যে উড়িষ্যার জমিদার ও পাইক বিদ্রোহ (১৮০৪-১৭), ১৭৯০ এর দশকে মাদ্রাজে পলিগার বিদ্রোহ, ১৮০১ সালে দিন্দিগুল ও মালাবারের পলিগার বিদ্রোহ, ১৮০৫ সালের দেওয়ান ভেলু তাম্পির ত্রিবাংকুর বিদ্রোহ, মোপলা বিদ্রোহ (১৮৩৬-৫৪), ১৮২৪ থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে বারবার গুজরাটের কোলি বিদ্রোহ, মহারাষ্ট্রে ১৮২৪ থেকে ১৮২৯ সালের মধ্যে কিট্টুর বিদ্রোহ, ১৮২৪ সালের কোলাপুর বিদ্রোহ, ১৮৪১ সালের সাতারা বিদ্রোহ, ১৮৪৪ সালের গদকরী বিদ্রোহ, এবং উত্তরভারতের জাঠ বিদ্রোহ (১৮২৪), আলিগড়ের তালুকদার বিদ্রোহ (১৮১৪-১৭) ও জব্বলপুরের বুন্দেলা বিদ্রোহ (১৮৪২) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত এই সব বিদ্রোহ ছিল ইতস্তত বি(িপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা। স্থানীয় সমস্যা ও ে(াভ-অসন্তোষকে কেন্দ্র করে এই সব বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। বিদ্রোহীদের ে(াভ ও অসন্তোষের কতটুকু প্রতিকার হয়েছিল বা আদৌ কোন প্রতিকার হয়েছিল কিনা, আপাতত সে প্র্ন অবান্তর। বর্তমানে ল(্যণীয় বিষয় এই যে, এগুলির কোনটিরই কোন সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল না এবং এক অঞ্চলের বিদ্রোহীদের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের বিদ্রৌহীদের কোন যোগসূত্র ছিল না। ইংরেজ শাসনের বি(দ্ধে সংগঠিত হলেও এই সব বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। অশি(িত কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। তাছাড়া একমাত্র ইংরেজ শাসনই নয়, অনেক সময়েই বিদ্রোহীদের আত্র(মণের ল(্য স্থল ছিল দেশী জমিদার ও মহাজন শ্রেণী, যারা কৃষকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করতো।

কৃষকেরা ছাড়া (মতাচ্যুত দেশীয় রাজন্যবর্গ, কোম্পানীতে কর্মরত সিপাহীরা, এমনকি বহু সাধারণ মানুষও ইংরেজ শাসনে ুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের আগেও সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল। এই প্রসঙ্গে ১৮০৬ সালে ভেলোরের সিপাহী বিদ্রোহের কথা আমাদের মনে আসে। যাই হোক ১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্রোহই— যা প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শু(হলেও, পরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত হিন্দী বলয়ে, একটি গণ বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল— প্রথম ইংরেজ শাসনের ভিত কাপিয়ে দিয়েছিল। এই বিদ্রোহের একটি সর্বভারতীয় চরিত্র না থাকলেও বা এই বিদ্রোহকে একটি জাতীয় বিদ্রোহ বলা চলে কিনা তা নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক থাকলেও আগেকার পুরোমাত্রায় আঞ্চলিক বিদ্রোহের তুলনায় যে এই বিদ্রোহ অনেক ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল এবং এতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অংশ না নিলেও যে এর পরিধি ছিল পরিব্যাপ্ত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আগেকার বিদ্রোহগুলি কখনই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন করে নি। এই বিদ্রোহই প্রথম হিন্দু ও মুসলমান

তাদের ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইংরেজদের বি(দ্ধে ঐক্যববদ্ধ সংগ্রাম করেছিল। এমন কি তারা ইংরেজ শাসনের বিকল্প হিসাবে দ্বিতী বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার পর অবশ্য কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহে কিছুটা ভাঁটা পড়েছিল। উল্লেখযোগ্য ব্যতিত্র(ম ছিল নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০), মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৫) ও পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৩) ও মোপলা বিদ্রোহ (১৮৭৩-৮০)।

ল(করবেন ভারতের নিম্নবর্গের মানুষ কৃষক ও উপজাতিরা যখন একটানা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলছিল, তখন ভারতের, বিশেষভাবে বাংলার শি(িত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, রামমোহন, ডিরোজিও ও বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ শাসনকে বরণ করে নিয়েছিল ও ইংরেজ বিরোধী সর্বপ্রকার আন্দোলন থেকে দূরে ছিল। এই শ্রেণী চেয়েছিল ইংরেজী শি(াদী(া ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বরণ করে আধুনিকতার মন্ত্রে দী(িত হয়ে নিজেদের ইংরেজদের সমক(করে তুলতে। ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ এমনকি নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতেও ঘৃণা বোধ করতেন। পশ্চিম সম্পর্কে তাঁদের এই অন্ধ মোহ ও অনুকরণপ্রিয়তা কাটতে অবশ্য খুব একটা দেরী হয় নি। মহাবিদ্রোহের পর থেকে তাঁদের মধ্যেও হতাশা ও কিছুটা অনুশোচনা দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তে আত্ম-সমালোচনার কথা মনে করতে পারি।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখলাম যে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ কোনদিনই ব্রিটিশ শাসনকে অন্তর থেকে মেনে নেয় নি। কিন্তু তাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন একটি সর্বভারতীয় রূপ না পাওয়ায় এবং তা ঐক্যবদ্ধ পথে পরিচালিত না হওয়ায় ইংরেজদের প(এই সব আন্দোলন দমন করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। অন্যদিকে এই সব আন্দোলন ভারতবাসীর দাবীদাওয়া পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কাজেই সর্বস্তরের মানুষের (োভ ও অসন্তোষের অবসান হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত ছিল। মহাবিদ্রোহ থেকে শি(া নিয়ে ইংরেজরা অবশ্য কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে ভারতীয় সদস্যদের ঠাঁই দেন, উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মন বোঝা এবং তারা ব্রিটিশ শাসন কিভাবে গ্রহণ করছে বা এই বিষয়ে তাদের মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়া। কিন্তু নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়নের মাধ্যমে ভারতীয় সদস্যদের নিয়োগ করা হতো বলে এই উদ্দেশ্য ও সাধু সংকল্প অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। বাস্তব এই প্রয়োজন ও তাগিদের অনিবার্য পরিণতি তহলো ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু যে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রাথমিক শর্ত হলো ব্যাপক (োভ ও অসন্তোষের প্রতিকার করার মানসিকতা এবং তার ওপর ভিত্তি করে দাবীদাওয়া তুলে ধরা। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা তাই ব্রিটিশ বিরোধীতার উৎস অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করবো।

১(ক).৩ ব্রিটিশ বিরোধিতার উৎস সন্ধানে

মহাবিদ্রোহের পর শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের যে সীমিত সুযোগ ইংরেজরা দিয়েছিল, তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল। তাছাড়া পরাধীন দেশকে শোষণ করে মাতৃভূমির সমৃদ্ধিই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল ভিত্তি। ভারতবাসীর স্বার্থ র(া করার কোন দায় বা তাগিদ ইংরেজদের ছিল না। তবু ১৮৫৮ সালের পর কোন দেশীয় রাজ্য গ্রাস না করার নীতি গ্রহণ করে বা ভারতবাসীর ধর্মে হস্তে(প না করে ইংরেজরা তাদের খুশি করতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার অনিবার্যভাবেই সমাজের প্রতিটি স্তরে (োব ও অসন্তোষের সঞ্চার করেছিল।

১(ক).৩.১ কৃষকশ্রেণীর ক্ষোভ

ভারতীয় জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকশ্রেণী ব্রিটিশ শাসনে (ব্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিল। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে ভারতের এক এক অংশে এক এক রকম ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। যেমন বাংলায় ছিল জমিদারদের সঙ্গে চিরস্তায়ী ব্যবস্থা, উত্তরভারতের ছিল মহালওয়ারি ব্যবস্থা এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে ছিল রায়তওয়ারি ব্যবস্থা। কিন্তু সর্বত্রই কর ও রাজস্বের বোঝা ছিল অত্যন্ত চড়া। তাছাড়া ছিল সুদখোর মহাজন সাহুকারদের শোষণ ও অত্যাচার। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় কৃষকদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের কার্যত কোন পথই খোলা ছিল না। সরকার অবশ্য কৃষকদের জন্য কিছুই করে নি, এ অভিযোগ সত্য নয়। বিভিন্ন প্রজাসত্ত্ব আইন ও মহাজন প্রথা বিরোধী কিছু আইৰ সরকার তৈরী করেছিল। কিন্তু এই সব আইনের কার্যকারিতা কতটুকু ছিল, তা নিয়ে প্র(ে উঠতেই পারে। বস্তুত আইন আদালত, থানা, দারোগা ইত্যাদি সবই ছিল শোষকশ্রেণীর প(ে। নানা অজুহাতে কৃষকদের জমিজমা থেকে উৎখাত ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। কৃষকেরা বিদ্রোহ করলে আইনশৃঙ্খলার দোহাই পেড়ে তা নির্মমভাবে দমন করা হতো।

১(ক).৩.২ রাজা, মহারাজা ও জমিদারদের ক্ষোভ

(মতাচ্যুত রাজা মহারাজারা ইংরেজদের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। তবে ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের (''আমরা বর্তমান সাম্রাজ্য সীমারেখার অধিকতর বিস্তৃতি চাই না'') পর তাঁদের ত্রে(াধ ও (োভের উপশম হয়েছিল। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে জমিদার শ্রেণীও সরকারের উপর খুশি ছিল। রায়তদের বি(দ্ধে তাদের হাত শক্ত(করতে জমিদারদের অনুকূলে কিছু আইন (যেমন ১৭৯৫ সালের ৩৫ রেগুলেশন, ১৭৯৯ সালের ৭ম রেগুলেশন ইত্যাদি) প্রণীত হওয়ায় তারা ইংরেজ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সরকার কৃষকদের স্বার্থ র(া করার জন্য কয়েকটি প্রজাসত্ত্ব আইন (যেমন ১৮৫৯ সালের দশম আইন, ১৮৮৫ সালের প্রজাসত্ত্ব আইন, ১৮৬৮

সালের অযোধ্যায় উনবিংশ আইন ইত্যাদি) প্রণয়ন করায় জমিদার শ্রেণী (ুব্ধ হয়। সরকারী নীতির প্রতিবাদ করে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ(মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন— "Agitate ! Agitate !! Agitate!!!'

১(ক).৩.৩ পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষোভ

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে পুঁজির বিকাশ ঘটে এবং আধুনিক শিল্পের উদ্ভব হয়। বোম্বাই ও আমোদবাদে বস্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছিল ভারতীয় পুঁজিপতিদের উদ্যোগে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করায় তারা (ুব্ধ ছিল। তাদের অভিযোগ ছিল এই যে, ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ র(া করতে গিয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের বাণিজ্যিক ও শিল্পনীতি বি(ে-ষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক অমিয় বাগচী দেখিয়েছেন যে প্রথম বি(্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত অবাধ ও মুক্ত(বাণিজ্য ছিল সরকারী নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ক্তি(এই নীতি ইংরেজদের স্বার্থের অনুকূলে হলেও ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। এই নীতি ভারতীয় পুজির বিকাশের পথে একটা প্রধান অন্তরায় ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় ইংরেজরা ভারতকে একটি কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ বলে মনে করতো। ব্রিটিশ শিল্পপতি ও পুঁজিপতিরা চেয়েছিল ভারতকে তাদের উদ্ধৃত পণের বাজারে পরিণ তকে একটি কায়েমী স্বার্থ গড়ে তুলতে। ভারতী পুঁজিপতিদের প(একটা দীর্ঘ দিন এটা মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। তারা চেয়েছিল সংর(ণ নীতির মাধ্যমে ভারতীয় শিল্প প্রয়াসকে উৎসাহ দেওয়া হোক। কিন্তু বিদেশী শাসনে তা কখনই সম্ভব ছিল না। সরকারী আনুকূল্য ও সহযোগিতার কোন সুযোগই ছিল না।

১(ক).৩.৪ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষোভ

ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতের হস্তশিল্প ও কা(শিল্প বিশেষভাবে (তিগ্রস্ত হয়। ম্যানচেষ্টারের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় ভারতীয় তাঁতিদের সর্বনাশ হয়। বিভিন্ন কুটির শিল্পে নিযুক্ত(হস্তশিল্পীরা বেকার হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এক নতুন শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। পৃথিবীর সর্বত্র কলে কারখানায় নিযুক্ত(শ্রমিকদের যে ধরনের দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হতো, ভারতের (েত্রেও তার কোন ব্যতিক্র(ম হয় নি। এদের মজুরি ছিল অত্যন্ত কম এবং জীবনযাত্রার মান ছিল অত্যন্ত নিচু। একটি সরকারী প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছে যে আমেদাবাদে শ্রমিকদের ১২ ঘন্টা (বিদ্যুৎচালিত কারখানায় ১৪ ঘন্টা), বোম্বাই-তে ১২ ঘন্টা (বিদ্যুৎচালিত কারখানায় ১৩ ঘন্টা), দিল্লীতে ১৩½ ঘন্টা থেকে ১৪½ ঘন্টা এবং কলকাতার চটকলে ১৫ থেকে ১৬ ঘন্টা পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। কোন কোন ছোট কারখানায় শ্রমিকেরা ১৭-১৮ ঘন্টা, এমনকি ২০-২২ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতো। চা-বাগিচা ও কফি চাষে নিযুক্ত(শ্রমিকদের

অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্গীন। এদের অবস্থা ছিল প্রায় ক্রীতদাসের মত। সবচেয়ে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় বাগিচা মালিকদের অন্যায় অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারই ছিল না। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলেও শ্রমিকেরা সব সময় এই সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতো না। ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে ২৫ টি বড় ধরনের ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল।

১(ক).৩.৫ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষোভ

সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ যতই ুব্ধ থাকুক, তাদের প(কোন সর্বভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও ব্রিটিশ শাসনে ুব্ধ হলেও সক্রি(য় বিরোধিতার পথে যায় নি। বরং অনেক সময় তারা পুঁজির বিকাশের জন্য শাসক শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল ছিল। সমাজের মধ্যবিত্ত ও শি(িত সম্প্রদায়ই ছিল সবচেয়ে বেশি ুব্ধ এবং ব্রিটিশ বিরোধিতা তাদের মধ্যেই ছিল সবচেয়ে তী(ও তীব্র। এরা প্রথমদিকে ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানালেও ইংরেজদের সহৃদয়তা ও উদারতা সম্পর্কে এদের মোহভঙ্গ হয়। ব্রিটিশ শোষণের চেহারা বা প্রকৃতি এদের কাছেই ছিল সবচেয়ে স্পষ্ট। ভারতের দারিদ্র্যের জন্য এরা ব্রিটিশ সরকারকেই দায়ী করতো। এরা তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের রাজস্বনীতি, শিল্প প্রয়াসে ভারতের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ, শি(া, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মৌলিক জনকল্যাণকর কাজের প্রতি সরকারের উদাসীনতা, প্রশাসনিক ব্যয়বৃদ্ধি ইত্যাদির সমালোচনা করেছিল। এদের ে াভের একটা বড় কারণ হলো উচ্চ শি(িত হওয়া সত্ত্বেও সর্বপ্রকার উচ্চ সরকারী পদে তাদের নিয়োগের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। I.C.S পরী(ায় ইংরেজ যুবকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পরী(ায় তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল খুব কম। শি(িত যুবকদের মধ্যে ক্র(মবর্ধমান বেকারীও তাদের হতাশ করেছিল। এদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে উচ্চাকাঙ্খা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরা ভারতের শাসনকার্যে সক্রি(য় অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল। গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদে ভারতীয় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির দাবীতে তারা সোচ্চার ছিল। এদের অভিযোগের আর একটি বড় কারণ হলো কালা আদমীদের প্রতি ইংরেজদের ঘৃণা ও উন্নাসিকতা। তারা ভারতীয়দের মানুষ বলেই মনে করতো না। ইউরোপীয় ক্লাবে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ট্রেনে একই কামরায় তারা ভারতীয়দের সঙ্গে ভ্রমণ করতো না। অশি(িত নিম্নবর্গের মানুষ মানবতার প্রতি এই অপমান ও জাতি বৈষম্য মেনে নিলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তা মানতে প্রস্তুত ছিল না। ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় আমরা এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর ে াভ ও দৃঢ় প্রতিবাদী মনোভাব প্রত্য(করি।

১(ক).৩.৬ মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষোভ

ইংরেজ শাসনের মুসলিম জনগণও খুব ুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিল। তাদের এই ে াব অস্বাভাবিক ছিল না। প্রথমত(তারা মনে করতো শাসক শ্রেণী হিসাবে তাদের অপসৃত করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কায়েম

হয়েছিল। দ্বিতীয়ত(হুমায়ুন কবীর দেখিয়েছেন যে ইংরেজ শাসনে অধিকাংশ মুসলমান ভূস্বামী তাদের জমিজমা হারিয়েছিল। তৃতীয়ত ঃ প্রশাসনের ভাষা হিসাবে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার তারা মেনে নিতে পারে নি। হিন্দুরা যেমন ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শি(া বরণ করে আধুনিকতার মন্ত্রে দী(িত হয়েছিলো, মুসলমানেরা তার ঠিক বিপরীত নীতি অনুসরণ করেছিল। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে অবশ্য মুসলিম সম্প্রদায় স্যার সৈয়দ আহমেদের আদর্শে দী(িত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধিতার পথ পরিত্যাগ করে।

১(ক).৪ রাজনৈতিক সংগঠনের সূত্রপাত

ব্রিটিশ বিরোধিতা একটি সুস্পষ্ট ও কার্যকরী রূপ পেয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে। মহাবিদ্রোহের আগেই এই প্রচেষ্টা শু(হয়েছিল। রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। মহাবিদ্রোহের আগে যে সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ১৮৩৭ সালে রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি এবং ১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি। ১৮৫১ সালে উভয় প্রতিষ্ঠান মিলিত হয়ে গঠন করে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ র(া করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান। বাংলার বাইরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন ও বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশন।

মহাবিদ্রোহের পর শুধু ভারতেরই নয়, ভারতের বাইরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ভারতের বাইরে প্রতিষ্ঠিত একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সংগঠন হলো ইষ্ট ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। ১৮৬৬ সালে লণ্ডন শহরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দাদাভাই নওরোজীর উদ্যোগে। ভারতে তিনটি প্রেসিডেন্সির (বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত এই রাজনৈতিক সংগঠনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন অধ্যাপক অনিল শীল তাঁর Emergence of Indian Nationalism গ্রন্থে। এই সব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে। উচ্চ বিত্ত ও উচ্চ শি(িত এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষও—যাদের এক কথায় আমরা ''এলিটিষ্ট'' বলে থাকি— এই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল। সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষের কোন ঠাঁই এখান ছিল না।

১(ক).৪.১ বাংলার রাজনৈতিক সংগঠন

মহাবিদ্রোহের পর বাংলায় বেশ কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এই সব প্রতিষ্ঠান ছিল জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার সূতিকাগৃহ। ১৮৬০ সালে রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল হিন্দুমেলা। আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সঞ্জীবনী সভা। রবীন্দ্রনাথ তার ''জীবনস্মৃতি'' গ্রন্থে এদের কথা উল্লেখ করেছেন। এর পর

১৮৭৫ সালে স্থাপিত হয় ইন্ডিয়ান লীগ। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ। এর কর্মকর্তাদের মধ্যে ৬৮% ছিলেন মধ্যবিত্ত, ৩৮% আইনজীবী এবং ১৪% ছোট ও মাঝারি জমিদার এবং ঐ সংখ্যক শি(ক ও কর্মচারী। ইন্ডিয়ান লীগ অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। এর পর ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। এর প্রাণ পু(ষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ছিল শি(িতদের প্রতিষ্ঠান। এর সদস্যদের ৩৩% ছিলেন শি(ক ৩৫% আইনজীবী। অনেকেই ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। বড় জমিদার ও শিল্পপতিরা এর সঙ্গে যুক্ত(ছিলেন না। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রভাব দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৮৭৬ সালে এর শাখা ছিল মাত্র দশটি। দশ বছরের মধ্যে ১৮৮৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় আশিটিতে। বাংলার বাইরেও বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে সুরেন্দ্রনাথ জনমত গঠন করেন। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান দাবীগুলির মধ্যে ছিল I.C.S. পরী(ার বয়স বাড়ানো ও তা ইংল্যান্ডের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও নিতে হবে, পৌরসভা ও আইন সভায় অধিকতর আসন দিতে হবে ইত্যাদির প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কৃষক শক্তি(সম্পর্কে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনই প্রথম সচেতন হয় এবং কৃষকদের দলে টানার জন্য বাৎসরিক সদস্য চাঁদা নির্ধারিত হয়েছিল মাত্র এক টাকা। অন্যান্য সদস্যের চাঁদার হার ছিল বাৎসরিক পাঁচ টাকা। কৃষকদের স্বার্থ র(া করার জন্য বেশ কয়েকটি কৃষক সভাও ডাকা হয়েছিল। তবু এদের কৃষকবন্ধু বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এই প্রতিষ্টানের অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্যে ছিল দেশীয় সংবাদপত্র আইন, অস্ত্র আইন ও অন্যান্য দমনমূলক আইনের বি(দ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, বর্ণবৈষম্য নীতির বি(দ্ধে সেই বিতর্কেও ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন সক্রি(য় ভূমিকা নিয়েছিল। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের এই সব কার্যকলাপ অবশ্যই সরকারের মনঃপুত ছিল না।

১(ক).৪.২ পশ্চিম ভারতের (বোম্বাই প্রেসিডেন্সি) রাজনৈতিক সংগঠন

পশ্চিম ভারতের সবচেয়ে রাজনৈতিক সংগঠন হলো পুনা সার্বজনিক সভা। ১৮৭০ সালে এই সভা গড়ে উঠেছিল বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, গণেশ বাসুদেব যোশি, এস. এইচ. চিলিংকার প্রভৃতি কয়েকজন উদ্যমী ব্যক্তি(র আন্তরিক প্রচেষ্টায়। অধ্যাপক অনিল শীলের মতে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকার সঙ্গে পশ্চিম ভারতের রাজনীতিতে পুনার সার্বজনিক সভার ভূমিকা তুলনা করা যায়। এই সভার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সর্দার, জমিদার, ব্যবসাদার, অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী, উকিল, সাংবাদিক শি(ক ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষ। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। তবে এই সভা কেবলমাত্র উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামায় নি। কৃষকদের দাবী দাওয়া নিয়েও তারা আন্দোলন করেছিল। ১৮৭২ ও ১৮৭৬-৭৮ দুর্ভি(ের সময় তার ত্রাণকার্যে অংশ নিয়েছিল। এই সভা বোম্বাইতে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করেছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম প্রচার করা ছিল তাদের একটি বড় কাজ। তবু সাধারণ মানুষ বিশেষত কৃষকদের প্রতি তাদের এই ক(ণা ছিল অনেকটাই লোকদেখানো। এদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল

দরিদ্র মূলধনহীন চাষীদের হাতে জমি দেওয়া সম্ভব নয়।'' ১৮৮৮ সালে ফুলে শূদ্রদের সার্বজনিক সভার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে নির্দেশ দেন। পশ্চিম ভারতের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন হলো বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এ্যাসোসিয়েশন। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। এটি গড়ে উঠেছিল ফিরোজ শাহ মেহতা, বদরুদ্দী তায়েবজী ও তেলাঙ্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

১(ক).৪.৩ দক্ষিণ ভারতের (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি) রাজনৈতিক সংগঠন

কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের শাখা হিসাবে ১৮৫২ সালে মাদ্রাজে স্থাপিত হয়েছিল মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু নানা কারণে ১৮৬২ সালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান নিষ্ি(য় হয়ে পড়েছিল। তবে কয়েক বছরের মধ্যেই সুব্রহ্মণ্য আয়ার, বিজয়রাঘবাচারি, রঙ্গিয়া নাইডু, আনন্দ চার্লু, রামস্বামী মুদালিয়ার প্রমুখের উদ্যোগ ও নেতৃত্বে নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন নবজন্ম লাভ করে। লর্ড রিপনের উদারনৈতিক শাসন, বিশেষত তাঁর সায়ত্তশাসন নীতি এঁদের গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু শীঘ্রই সদস্যদের মধ্যে মতভেদের ফলে সংগঠনে ভাঙ্গন ধরে। ১৮৮৪ সালে প্রতিবাদী নবীন সদস্যরা প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাজ মহাজন সভা। এই সভা প্রতিষ্ঠা করার একটা উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত প্রায় একশো সমিতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে একটি ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা। এই সভার প্রধান দাবী ছিল— আইনসভার সম্প্রসারণ ও রাজস্ব বিভাগের কাজকর্ম থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ। মহাজন সভার মাধ্যমে মাদ্রাজ দ(িণ ভারতের সংকীর্ণ গন্ডি অতিত্র(ম করে ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হবার সুযোগ পায়। মফঃস্বল শহরে সভা সমিতি আহ্বান করে ও মাদ্রাজ শহরে বাৎসরিক অধিবেশনের মাধ্যমে এই সভা জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের আদর্শ ছড়িয়ে দেয়। ল(করার বিষয় ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম অধিবেশনে এই সভা যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তার সঙ্গে ১৮৮৩ সালে কলকাতায় ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সভা বা ন্যাশান্যাল কনফারেন্সের প্রস্তাবের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল।

১(ক).৫ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা — তর্ক বিতর্ক

১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই শহরে আহুত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রহস্যাবৃত। কার নেতৃত্বে বা উদ্যোগে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র তর্কবিতর্ক ও মতভেদ আছে। ল(করার বিষয় যখন বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল, ঠিক সেই সময়ই কলকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সুরেন্দ্রনাথের ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৩ সালে। ল(্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে কোন গু(তর মত পার্থক্য ছিল না। তাহলে এই দুই সংগঠনের অধিবেশন কেন একই সঙ্গে ভারতের দুই

প্রান্তের দুই শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তার কোন সহজবোধ্য ব্যাখ্যা মেলে না। সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বা অবহিত না করেই কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল। কেন তাঁকে অবহিত করা হয় নি, সে প্র(ে উঠতেই পারে। তবে ১৮৮৬ সালে কলকাতায় যখন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসেছিল, তখন সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের অস্তিত্ব বিলোপ করে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু জন্মলগ্নেই একটা বোঝাপড়ার অভাব নিশ্চয় আকাঙ্খিত ছিল না। যাই হোক মূলত তিনটি প্র(ে ও বিতর্কের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করবো এই পরিচ্ছদে। (১) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কার উদ্যোগে? (২) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কারণ কি ছিল? ও (৩) রজনীপাম দত্তের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব।

১(ক).৫.১ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেরণা ও উদ্যোগ

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেরণা ও উদ্যোগ নিয়ে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করেছেন। পট্টভি সীতারামাইয়ার মতে ১৮৭৭ সালে অনুষ্ঠিত দিল্লী দরবারই নাকি প্রথম একটি জাতীয় সভা আহ্বানের প্রেরণা দিয়েছিল। আবার প্রথম কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য জি সুব্রামনিয়া আইনয়ার মনে করেন ১৮৮৩ সালে কলকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়েছিল তাই জাতীয় নেতাদের এক সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছিল। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম সভাপতি হিউমের জীবনীকার ওয়েডারবার্ণ, পট্টভি সীতারামাইয়া, রজনীপাম দত্ত, অধ্যাপক নিমাই সাধন বসু প্রভৃতি লেখক মনে করেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ্যালাই অক্টাভিয়ান হিউমের প্রচেষ্টা ও উদ্যমে। ১৮৮৩ সালের ১লা মার্চ হিউম কলকাতা বি(বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে স্নাতক পরী(ায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখিত এক খোলা চিঠিতে তাদের দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন এবং দেশের কাজে এগিয়ে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এর পর তিনি ১৮৮৫ সালে বড়লাট ডাফরিনের সঙ্গে সা(াৎ করে তাঁকে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ করেন। এর ফলেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু চরমপন্থি নেতা লালা লাজপৎ রায় মনে করেন লর্ড ডাফরিণই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। আবার কর্ণেল অলকট, রঘুনাথ রাও, নরেন্দ্রনাথ সেন ও এ্যানি বেসান্ত মনে করেন ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত থিওজফিষ্টদের এক সমাবেশেই প্রথম কংগ্রেসের মতে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কেউই সুরেন্দ্রনাথের দাবী বা অবদানের কথা উল্লেখ করেন নি। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী এর জন্য কিছুটা আ(েপ করেছেন।

প্রথমে আসা যাক সুরেন্দ্রনাথের কথায়। এ কথা সত্য যে হিউমের অনেক আগেই সুরেন্দ্রনাথ একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনের কথা ভেবেছিলেন। ১৮৮৩ সালে কলকাতায় জাতীয় সম্মেলনের আহ্বান ছিল তারই বহিপ্রকাশ। কাজেই তিনি প্রত্য(ভাবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা না হলেও তাঁর মনের গভীরেই কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। অনেকটা এই কারণেই অধ্যাপক ত্রিপাঠী সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সম্মেলনকে

''জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া'' বলে উল্লেখ করেছেন। তবু যেহেতু তিনি প্রত্য(ভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বা যে কোন কারণেই হোক তাঁকেবাদ দিয়েই কংগ্রেস স্থাপিত হয়েছিল, সেহেতু তাঁকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় না। আবার অন্যদিকে কংগ্রেসের পরিকল্পনা তাঁর মাথা থেকেই প্রথম বেরিয়েছিল বলে তাঁকে কংগ্রেসের জনক বলে মেনে নিত আপত্তির কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে থিওজফিষ্টদের দাবী কোন ত্র(মেই মেনে নেওয়া যায় না। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, এ্যানি বেসান্তের ভাষ্য ছাড়া আমাদের কাছে এমন কোন তথ্য নেই, যাতে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে থিওজফিষ্টদের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া এ্যানি বেসান্তের ভাষ্যের মধ্যেও অনেক গরমিল আছে। অন্যদিকে অধ্যাপক ত্রিপাঠী, ডঃ বিপান চন্দ্র ও ডঃ অনিল শীল প্রভৃতি আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হিউমের দাবী পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। এঁদের মতে হিউম ব্যক্তি(গত উদ্যোগ না নিলেও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হতো, কারণ ভারতবাসী এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা যে অনেক দিন আগে থেকেই ভাবছিল, সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সম্মেলন ছিল তার প্রমাণ। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ডাফরিনের দাবী আরও দুর্বল, কারণ তিনি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। বরং কংগ্রেসকে তিনি আগাগোড়াই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। হিউমের প্রস্তাবও তিনি সুনজরে দেখেন নি। হিউমের সঙ্গে তার তীব্র মতবিরোধ ছিল। ডাফরিন যদি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হতেন, তাহলে তিনি কখনই কংগ্রেসকে ''আণুবী(ণিক সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি'' বলে উপহাস করতেন না।

আমাদের ওপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, হিউম, ডাফরিন, থিজফিষ্টদের এবং এমন কি সুরেন্দ্রনাথকেও এমনভাবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। আসলে কোন ব্যক্তি(বিশেষকে বোধহয় কংগ্রেসের জন্মদাতা হিসাবে চিহ্নি(ত করা যায় না। অধ্যাপক বিপানচন্দ্রের মতে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না বা তাকে কোন ''ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা'' বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এর পিছনে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ছিল। ১৮৬০-এর দশক থেকে ভারতে যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়েছিল, তার মধ্যেই কংগ্রেসের উৎস অনুসন্ধান করতে হবে। ভারতীয়দের এই রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ছিল বিভিন্ন শহরে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সংগঠনগুলি। এদের মধ্যে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথের ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ছাড়া আর কোন সংগঠনের একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হতে পারে নি। এই অবস্থায় হিউমের উদ্যোগে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবে বিচার করলে হিউমকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে হতে পারে, কারণ তিনি এগিয়ে না আসলে ১৮৮৫ সালেই হয়ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হতো না। আবার অন্য এক বিচারে হিউম ছিলেন কালের হাতে পুতুল মাত্র। অর্থাৎ এই ধরনের এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতবাসীর মানসিক প্রস্তুতি না থাকলেও, তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা আদৌ সফল হতো কিনা সন্দেহ। আর এই মানসিক প্রস্তুতির কাজ অনেকটাই করে দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এক কথায় বলতে পারি যা ছিল সুরেন্দ্রনাথের

স্বপ্ন বা আদর্শ হিউম তার বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ একে চিলে অপরের পরিপূরক। কংগ্রেস ছিল ভারতের জনগণের রাজনৈতিক চেতনা এবং এই যৌথ প্রচেষ্টার পরিণতি।

১(ক).৫.২ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কারণ ও উদ্দেশ্য

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রে(াপট সম্পর্কে অবহিত হবার পর আপনাদের মনে সঙ্গত কারণেই যে প্র(ে উদিত হতে পারে, তা হলো একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় ভারতীয়দের উদ্যম ও আগ্রহ থাকলেও হিউমের মত একজন দ(ইংরেজ রাজপু(ষ ও অবসপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান তা নিয়ে কেন মাথা ঘামালেন। কিন্তু আগের কথা আগে। ভারতীয়দের দিক থেকে আগ্রহের কারণ হলো ১৮৮৫ সালের আগে যে সব রাজনৈতিক সংগঠন ইতস্ততভাবে ভারতের বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছিল, তার ফলে কোন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন সঠিক পথে পরিচালিত হবার কোন সুযোগ ছিল না। ভারতীয় জনগণের এই অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা ভারতীয়দের হবার কোন সুযোগ ছিল না। ভারতীয় জনগণের এই অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার ও দাবী থেকে বঞ্চিত করছিল। এই অবস্থায় ভারতে জাতি গঠনের কাজ অত্যন্ত জ(রী ছিল। ভারতের শি(িত মানুষ উপলব্ধি করছিল যে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ছত্রছায়ায় সমবেত করতে না পারলে এই জাতি গঠনের কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। সুরেন্দ্রনাথ, তিলক প্রভৃতি নেতা এই বাস্তব অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন ছিলেন। এমনকি ১৯২৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর লিখিত বইয়ের নাম রেখেছিলেন— "A nation is Making." ভারতের মানুষেরা যাতে এক অখণ্ড ঐক্য এ জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দী(িত হতে পারে এবং যাতে তারা পরস্পর পরস্পরের আরও কাছে আসতে পারে, তার জন্য স্থির হয়েছিল যে, কংগ্রেসের অধিবেশন প্রতিবছর ভারতের বিভিন্ন শহরে সংগঠিত হবে এবং যে অঞ্চলে সেই অধিবেশন হবে, সেই অঞ্চলের কোন নেতা সভাপতি হতে পারবেন না। অর্থাৎ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশ ও জাতির স্বার্থে।

অন্যদিকে হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যম নিয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের স্বার্থে ও প্রয়োজনে। আবার ভারত প্রেমী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু ভারতে ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। লিটনের আমলে হিউম যখন সরকারী উচ্চপদে আসীন ছিলেন, তখন নাকি সাতখণ্ডের এক সরকারী নথি বা রিপোর্ট তাঁর হাতে আসে। এগুলি পাঠ করে তাঁর মনে হয় ভারতের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ এবং ভারতে এক গণবিদ্রোহ আসন্ন। ১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের কথা তখনও ইংরেজরা বিস্মৃত হয় নি। হিউমের আশঙ্কা হয় যে, এই পরিস্থিতিতে যদি শি(িত মধ্যবিত্ত শ্রেণীও এই বিদ্রোহে অংশ নেয়, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হতেপারে। এই সংকট থেকে ইংরেজদের র(া করার জন্য এবং ভারতবাসীর মন বোঝার উদ্দেশ্যে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার কথা চিন্তা করেন। তিনি জানতেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীও নানা কারণে (ুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। এই জন্যই তিনি কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় স্নাতকদের উদ্দেশ্যে

একটি খোলা চিঠি লেখেন। এর পর তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা ডাফরিনের কর্ণগোচর করেন। লালা লাজপৎ রায় মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করা, ভারতের স্বার্থ র(া করা নয়। অর্থাৎ ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার বা স্বাধীনতার মত কোন মহৎ আদর্শের দ্বারা হিউম অনুপ্রাণিত হন নি।

১(ক).৫.৩ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যে তত্ত্ব সব চেয়ে বেশি বিতর্ক ও উত্তপ্ত আলোচনার সৃষ্টি করেছে, তা হলো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। এর দুটি দিক ছিল। প্রথমটি হল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় হিউম ও কংগ্রেস নেতাবৃন্দের সুরেন্দ্রনাথকে পুরোপুরি অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা। হিউম যখন তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য ১৮৮৫ সালের মার্চ মাসে কলকাতা এসেছিলেন তখন তিনি নরেন্দ্রনাথ সেন (Indian Mirror পত্রিকার সম্পাদক) ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন নি। আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে সা(াৎ করলে হিউম তাঁর সঙ্গেও এ বিষয়ে কোন কথা বলেন নি। নভেম্বরের শেষে সুরেন্দ্রনাথ যখন হিউমের পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন, তখন তিনি তাঁর জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং তাঁর প(কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন হিউম ইচ্ছাকৃতভাবেই এ কাজ করছিলেন। তিনি আরও মনে করেন উমেশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথও এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত(ছিলেন।

দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র আরও গভীর ও ভয়ংকর। এই ষড়যন্ত্রও হয়েছিল কংগ্রেস স্তোদেরসঙ্গে হিউম-ডাফরিনের। ভারতীয় জনগণের ত্বীর (োভ ও রাষ যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে না পারে, তার জন্য কংগ্রেস ইংরেজদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছিল। ইংরেজরা চেয়েছিল কংগ্রেসকে এক ''নিরাপত্তামূলক যন্ত্র'' বা ''র(া কবচ'' হিসাবে ব্যবহার করতে। ১৯১৬ সালে চরমপন্থী নেতা লালা লাজপৎ রায় নরমপন্থী নেতাদের আত্র(মণ করার উদ্দেশ্যে ''নিরাপত্তা মূলক যন্ত্র'' তত্ত্ব ব্যবহার করেন। এর প্রায় পঁচিশ বছর পরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার উপর ভিত্তি করে প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও লেখক রজনীপাম দত্ত এই ভিমত প্রকাশ করেন যেন হিউম, ডাফরিন ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সবাই মিলে আসন্ন এক গণ অভ্যুত্থানের কণ্ঠ রোধ করার জন্য এক চত্র(ান্ত গড়ে তুলেছিলেন। অর্থাৎ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পিছনে কেবলমাত্র ''নিরাপত্তামূলক যন্ত্র'' বা ''র(াকবচ'' তত্ত্বই নয়, গভীরতর আরও একটি দুরভিসন্ধি ছিল। রজনীপাম দত্তের মতে শুধু সরকার নয়, কংগ্রেস নেতারাও আসন্ন গণ আন্দোলন সুনজরে দেখেন নি। তাই তাঁরাও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। সি. এফ. এন্ড্রুজ ও গিরিজা মুখার্জীও ''নিরাপত্তামূলক যন্ত্র'' বা ''র(াকবচ'' তত্ত্ব স্বীকার করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে এস.আর. মেহরত্র রজনীপাম দত্তের এই তত্ত্বের আংশিকভাবে সমর্থন করেছেন।

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী, অধ্যাপক বিপান চন্দ্র প্রভৃতি ঐতিহাসিক রজনীপাম দত্তের ষড়যন্ত্র তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করেছেন। অধ্যাপক ত্রিপাঠীর মতে ডাফরিন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় আদৌ আগ্রহী ছিলেন না এবং তাঁর সঙ্গে হিউমের গু(তর মতভেদ ছিল। সুতরাং তার প(এই ধরনের ষড়যন্ত্র অংশ গ্রহণ করা বি(াসযোগ্য নয়। আসলে হিউম ডাফরিন সম্পর্কে অনেক মনগড়া কথা বলতেন এবং উমেশচন্দ্রদের কাছেও বলেছেন। ''তারই ওপর ভিত্তি করে উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের জন্মকাহিনী লেখেন এবং সীতরামাইয়া, রজনীপাম দত্ত সবাই তা বি(াস করে বসেন।'' অন্যদিকে যে সাতখণ্ড সরকারী নথির উপর নির্ভর করে হিউম এক ব্যাপক গণ বিদ্রোহের আশঙ্কা করেছিলেন তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই প্র(তুলেছেন অধ্যাপক বিপানচন্দ্র। জাতীয় মহাফেজখানা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নাকি এই ধরনের কোন নথি পাওয়া যায় নি। হয়ত ইংরেজরা ভারত ছাড়ার আগে তা ধ্বংস করে দিয়ে ছিল। সবচেয়ে বড় কথা লিটনের সময়ই যদি হিউম একটি তীব্র গণবিদ্রোহের আশঙ্কা করে থাকেন, তাহলে কেন সাত বছর ধরে সরকার এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি, এ প্র(ওঠা স্বাভাবিক। অধ্যাপক বিপানচন্দ্রের মতে আসলে কোন সরকারী নথি থেকে নয়, হিউম আসন্ন এই গণবিদ্রোহের কথা জানতে পেরেছিলেন কয়েকজন অলৌকিক (মতাসম্পন্ন ধর্মগু(ও চেলাদের কাছ থেকে। হিউম প্রাচ্যধর্ম সম্পর্কে খুব আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মগু(র যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন অলৌকিক তত্ত্বেও তিনি বি(াসী ছিলেন। এই সব ধর্মগু(ও চেলারাই তাঁকে আসন্ন এই গণ অভ্যুত্থানের হাত থেকে ভারতকে র(া করার জন্য নাকি আবেদন জানিয়েছিলেন আর তার ভিত্তিতেই হিউম ডাফরিনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। ডাফরিন যে তাঁর সব কথা বি(াস করতেন না এবং মনে করতেন তার মাথায় ছিট আছে, সে কথা আগেই বলেছি। যাই হোক ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউম ভারতীয় নেতাদের দ্বারা নয় বরং ঐ সব গু(ও তাদের চেলাদের অলৌকিক (মতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুতরাং এ (ে ত্রে ষড়যন্ত্রের কোন অবকাশ ছিল না। তবে অনেকে একটি প্র(তুলতে পারেন, তা হলো কংগ্রেস নেতারা যধি ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে না থাকেন, তা হলে তাঁরা কেন হিউমের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন? এর উত্তরে বলা যায় ভারতপ্রেমী হিসাবে হিউমের খ্যাতি ছিল ও ভারতীয় জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। তাই তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে ভারতীয় নেতাদের কোন অসুবিধা হয় নি। তার চেয়েও বড় কথা হলো কংগ্রেস নেতারা ভেবেছিলেন যে, হিউমের মত একজন উচ্চপদস্থ প্রাত্ত(ন সরকারী কর্মচারীর উপস্থিতি কংগ্রেস সম্পর্কে সরকারের মন থেকে সর্বপ্রকার সন্দেহ সরিয়ে দেবে, অর্থাৎ হিউমের সঙ্গে সহযোগিতা ছিল এক বাস্তব প্রয়োজনীতা ও কৌশলমাত্র। এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র ছিল না।

১(ক).৬ কংগ্রেসের সামাজিক ভিত্তি

কংগ্রেসই ভারতের প্রথম জাতীয় সংগঠন, যার ছত্রছায়ায় সমবেত হয়েছিল জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ। আগে যে সব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল,

তাদের প্রভাব ছিল আঞ্চলিক, ল(্য ছিল সীমিত এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সঙ্কীর্ণ। প্রচলিত অর্থে অবশ্য, কংগ্রেসকে কোন রাজনৈতিক দল বলা যায় না, কারণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত এর কোন সংবিধান ছিল না বা অন্তত প্রথম দিকে কোন একজন ব্যক্তি(বিশেষ এর প্রধান বা নেতা ছিলেন না। এমনকি এর কোন সুস্পষ্ট সংগঠন ও মজুদ অর্থভাণ্ডার ছিল না। তবু কংগ্রেসকে ঘিরেই ভারতবাসী তাদের আশা আকাঙ্খা ও দাবীদাওয়া তুলে ধরতে ও তা আদায় করতে সক্রি(য় ছিল। সাধারণ মানুষ তাই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকতো।

কংগ্রেসের শ্রেণী চরিত্র ও সামাজিক ভিত্তি নিয়ে নানা জনে নানা অভিমত প্রকাশ করে এসেছেন। বামপন্থীরা আগাগোড়াই বলে এসেছেন যে কংগ্রেস হলো একটি বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান। প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতাদের সম্পর্কে এই ধরনের অভিযোগ ভ্রান্ত বলে মনে করেন অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী। সি.এস. বেইলির প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই সময়ে কংগ্রেসে জমিদার শ্রেণীরই প্রাধান্য ছিল। কংগ্রেসকে মোটা টাকার চাঁদা দিতেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজের মত বড় জমিদার বা ভিজিয়াননবগ্রাম ও বরোদার দেশীয় রাজন্যবর্গ। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যয় ভার বহন করেছেন নাটোর, ময়মনসিংহ, গৌরীপুর, নাড়াজোল, টাকী ও উত্তরপাড়ার জমিদার। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে কংগ্রেস তহবিলে মোটা টাকা দিতেন জমিদার বা ভূস্বামী শ্রেণী। উদাহরণ স্বরূপ মহারাষ্ট্রের নাটু ভ্রাতৃদ্বয়, পাঞ্জাবের রামভুজ দত্ত চৌধুরী ও মাদ্রাজের রামনাদের রাজার নাম করা যায়। উত্তর ভারতে তালুকদাররা অবশ্য সরকারের অনুগত ছিল। কংগ্রেসে জমিদার শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল বলেই কংগ্রেস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক ছিল।

জমিদাররা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত(থাকলেও কংগ্রেসকে কখনই তাদের প্রতিষ্ঠান বা মুখপাত্র বলা যায় না। সাধারণভাবে কংগ্রেস ছিল উচ্চ শি(িত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। অবশ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে ঠিক কাদের বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা কঠিন। অনেক সময়ে দেখা গেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আসলে ব্যাঙ্কার, বণিক বা জমিদার শ্রেণীর অনুগ্রহ পুষ্ট এবং তাদের হয়ে কাজ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ সি.এস. বেইলি এলাহাবাদের শি(িত মধ্যবিত্ত আইনজীবী ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত(মানুষের কথা বলেছেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজ সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন ত্রি(ষ্টিন ডবিন ও ডি.এ. ওয়াক্রুক। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী অবশ্য এই ধরনের ব্যাখ্যা পুরোপুরি গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। তাঁর মতে কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে ফিরোজ শা মেহতা, গোপাল কৃষ(গোখলে বা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কখনই অন্যের কথায় চলতেন না। এঁদের জমিদার বা বণিক শ্রেণীর মুখপাত্র বলেও মনে করার কোন কারণ নেই। আবার আনন্দমোহন বসু একজন শি(াব্রতী ও ব্যারিষ্টার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও আসলে তিনি ছিলেন জমিদার সন্তান। কে কথায় বলা যায় কংগ্রেসের আদি পর্বে জমিদার, বণিক এবং মধ্যবিত্ত সকলেই সক্রি(য় থাকলেও বণিকদের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য। গান্ধীর আবির্ভাবের পর অবশ্য বণিকদের প্রাধান্য চোখে পড়ে।

কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে যে সব সদস্য অংশ গ্রহণ করতেন, তা থেকে কংগ্রেসের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যায়। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত যে সব সদস্য কংগ্রেস অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাতে আইনজীবীদের সংখ্যাধিক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত ৪ বছরে কংগ্রেস অদিবেশনে মোট ২৩৬১ জন সদস্য যোগদান করেছিলেন। এঁদের মধ্যে আইনজীবীর সংখ্যা ছিল ৮৮৬ জন। আবার ১৮৯২ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানকারী ১৩,৮৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ৫,৪৪২ জন সদস্যই ছিলেন পেশায় আইনজীবী। ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত যে সব পেশাদারী মানুষ কংগ্রেস অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রতিনিধি সংখ্যা নিচে দেওয়া হলো।

	১৮৮৫	১৮৮৬	১৮৮৭	১৮৮৮
প্রতিনিধি সংখ্যা	৭২	৪৩৪	৬০৭	১২৪৮
আইনজীবী	৩৯	১৬৬	২০৬	৪৫৫
ডাক্ত(ার	১	১৬	৮	৪২
সাংবাদিক	১৪	৪০	৪৩	৭৩

১৮৯২ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত কংগ্রেস অদিবেশনে যোগদানকারী আইনজীবীদের সংখ্যা আগে বলেছি। ঐ সময়ে অন্যান্য শ্রেণী বা বৃত্তিজীবী সদস্যদের সংখ্যা ছিল যথাত্র(মে জমিদার ২৬২৯, বণিক ২৯০১, সাংবাদিক ৪৪১, ডাক্ত(ার ৪০৮, ও শি(ক ৪৩৮। কংগ্রেসে যোগদানকারী সদস্যের মধ্যে শতকরা ২৫ জন ছিলেন বি(বিদ্যালয়ের স্নাতক। সরকারী কর্মচারীদের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানে প্রথম দিকে উৎসাহ দেওয়া হতো না। পরে তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কংগ্রেসে শি(কদের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুব অল্প। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মাত্র দু-জন শি(ক উপস্থিত ছিলেন। চতুর্থ অধিবেশনে অবশ্য এই সংখ্যা ছিল ৫৯। তবে অধিকাংশ শি(কই ছিলেন কংগ্রেস আন্দোলনের সমর্থক। কংগ্রেসে আইনজীবীদের সংখ্যাধিক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডুডিথ ব্রাউন বলেছেন যে, শুধু ইংরেজী ভাষায় দ(তা বা সংবিধান সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান নয়, বড় দিনের ছুটির অবসরও, যা অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের কাছে সহজলভ্য ছিল না, তাঁদের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করার সুযোগ এনে দিয়েছিল।

ভৌগোলিক মাপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই তিন প্রেসিডেন্সি থেকে অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা ও সদস্য আসতেন। এর কারণ পাশ্চাত্য শি(ার সুযোগ এই সব অঞ্চলেই ছিল সব চেয়ে বেশি। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কত জন সদস্য কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন, নিচের পরিসংখ্যানে তা দেওয়া হলো।

বাংলা ও আসাম	—	৩,৯০৫
বোম্বাই ও সিন্ধু	—	৪,৮৫৭
মাদ্রাজ	—	৪,০৬২
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা	—	৩,০২৩
পাঞ্জাব	—	১,৫৪৭
মধ্যপ্রদেশ (C.P.) ও বেবার	—	২,১৭০
	মোট	১৯,৫৬৪

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৯৫ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত কংগ্রেস অধিবেশনে যে ১৯,৫৬৪ সদস্য যোগদান করে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১২,৮২৪ জনই এসেছিলেন বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে।

কংগ্রেস একটি ধর্মনিরপে(ও অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হলেও সেখানে হিন্দুদের, এবং বিশেষভাবে বর্ণহিন্দু বা ব্রাহ্মণদের সংখ্যাধিক্য আমাদের চোখে পড়ে। ১৮৯২ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত যে ১৩,৮৩৯ জন সদস্য কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ হিন্দুর সংখ্যা ছিল যথাত্র(মে ৫,৫২৩ ও ৬৮৬০। অশি(িত ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের কোন ঠাঁই হয় নি। কংগ্রেসের কাজকর্ম সব কিছুই হতো সাধারণের দুর্বোধ্য ইংরেজী ভাষায়। আসলে কংগ্রেসের সদস্যরা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। উভয়ের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দূরত্ব ছিল অনতিত্র(ম্য। সাধারণ মানুষ এঁদের সমীহ, এমন কি ভয় করতেন। কংগ্রেস নেতারা আচার আচরণ ও মানসিকতার দিক থেকে ছিলেন পুরোমাত্রায় ইউরোপীয়। তাই তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারতেন না। সুমিত সরকারের ভাষ্য থেকে জানতে পারি ফিরোজ শাহ মেহতা নাকি রেলের বিশেষ সেলুনে যাতায়াত করতেন। দাদাভাই নৌরজী নিজেদের এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, —''আমরা নিজেদের শ্রেণী ছাড়া অন্যান্যদের সম্পর্কে কতটুকু জানি?'' লালা লাজপৎ রায় কংগ্রেসের এই সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

অন্যদিকে কংগ্রেস অধিবেশনে মুসলিম সদস্যদের সংখ্যাল্পতাও আমাদের বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ১৮৯২ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত যে ১৩,৮৩৯ জন সদস্য কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন, তাদের মধ্যে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল মাত্র ৯১২ জন এবং এর মধ্যে আবার ১৮৯৯ সালে লখ্নৌ শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনেই ৩১৩ জন মুসলিম সদস্য যোগদান করেছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে একমাত্র বদ(দ্দীন তায়েবজী ছাড়া অন্য কোন মুসলিম নেতা র নাম পাওয়া যায় না। দুটি কারণে মুসলিম সম্প্রদায় কংগ্রেসে যোগ দেয় নি। প্রথমতঃ শি(াদী(ায় মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। স্বাভাবিক কারণেই তাই শি(িতদের প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে তাদের ঠাঁই হয়

নি। দ্বিতীয়ত, স্যার সৈয়দ আহমেদ মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে কংগ্রেস রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেন। তিনি কংগ্রেসকে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নি(ত করেন। বদ(দ্দীন তায়েবজ স্যার সৈয়দ আহমেদের এই নীতির বিরোধিতা করেও কিছু করতে পারেন নি। স্যার সৈয়দ আহমেদ তাঁর দ্বি-জাতি তত্ত্বে অটল থাকেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তায়েবজীর তুলনায় স্যার সৈয়দ আহমেদের প্রভাব ছিল বেশি। ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কংগ্রেসে যোগ দেয় নি এবং কংগ্রেস অধিবেশনে তাদের সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকে। ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদ অধিবেশনে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল মাত্র ২২২ জন। কিন্তু ছোটলাট কলভিনের মতে এতে কোন সম্ভ্রান্ত বা সম্পন্ন মুসলমান অংশগ্রহণ করে নি। পরের বছর বোম্বাই অধিবেশনে ২৪৮ জন মুসলিম প্রতিনিধি যোগ দেন। কিন্তু তার পর থেকেই তাদের সংখ্যা দিন দিনি হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৯৪ সালে মাদ্রাজ ও ১৮৯৫ সালে পুনায় আহুত কংগ্রেস অধিবেশনে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল মাত্র ২৩ ও ২৫ জন। পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে এই সংখ্যা আরও কমতে থাকে। একমাত্র ব্যতিত্র(ম ছিল ১৮৯৯ সালে আহুত লখ্নৌ কংগ্রেস, যার কথা আগেই বলেছি।

কংগ্রেস প্রথম সর্বভারতীয় বা জাতীয় সংগঠন হলেও সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ যে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত(ছিল না, এ কথা স্বীকার্য। আগেই বলেছি কংগ্রেস ছিল মূলত শি(িত মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপাত্র। তবুও কংগ্রেসের অভিনবত্ব এইখানে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সমস্ত ভারতবাসীর আশা আকাঙ্খা ও ইংরেজ বিরোধিতার প্রতীক হিসাবে নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে স(ম হয়েছিল। পরবর্তীকালে কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও কংগ্রেস যে একেবারে তাদের কথা ভাবে নি তা নয়। কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আধুনিক। ব্রিটিশ শাসনের ঔপনিবেশিক শোষণ ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরে কংগ্রেস নেতারা সমস্ত ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। দেশের সাধারণ মানুষের ওপর ইংরেজ রাজপু(ষদের অত্যাচার ও জাতি বৈষম্যের নগ্ন রূপ উন্মোচন করে তাঁরা সমস্ত ভারতবাসীর (োভ ও অসন্তোষের অনুভূতিকে বাঙ্ময় করেছিলেন। কংগ্রেসের আগে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এই ধরনের সর্বব্যাপী সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ও সা(্য দিতে পারে নি।

১(ক).৭ সারাংশ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা হলেও পরবর্তী একশো বছর ধরে ইংরেজরা একটু একটু করে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করতে তৎপর হয়েছিল। ভারতবাসীর কিন্তু অন্তর থেকে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে চায় নি এবং এই সময়ের মধ্যে একের পর এক অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন করেছিল। ভারতবাসীর এই ইংরেজ বিরোধিতা সবচেয়ে বেশি তীব্র আকার ধারণ করেছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে। সারা ভারত জুড়ে এই বিদ্রোহ

সংগঠিত না হলেও উত্তর ও মধ্যভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করতে স(ম হলেও ইংরেজ বিরোধিতার অবসান হয় নি। ইংরেজ বিরোধিতাকে একটি ঐক্যবদ্ধ পথে পরিচালিত করার জন্য যে তাগিদ ভারতবাসী অনুভব করছিল, ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা সফল হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এর পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি।

জনগণের মধ্যে ব্যাপক ে(াভ ও অসন্তোষ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ে(ত্র প্রস্তুত করেছিল। শ্রেণীগত বিচারে অবশ এই ে(াভের প্রকৃতি এক ধরনের ছিল না। কৃষকদের ে(াভের কারণ ছিল অতিরিক্ত(করের বোঝা জমিদার ও মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচার এবং সরকারী ঔদাসীন্য। জমিদারদের ে(াভের কারণ ছিল ঊনিশ শতকের দ্বিতয়ার্ধে কৃষকদের অনুকূলে প্রণীত বিভিন্ন প্রজাসত্ত্ব আইন। পুঁজিপতি শ্রেণীর ে(াভের কারণ ছিল ভারতীয় পুঁজির বিকাশে সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ে(াভের কারণ ছিল স্বল্প মজুরি ও অনুন্নত জীবনযাত্রার মান। সমাজে সবচেয়ে বেশি (ুব্ধ ছিল শি(িত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। মুসলিম সম্প্রদায়ও ব্রিটিশ শাসনে অত্যন্ত (ুব্ধ ছিল।

ে(াভ ও অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে গড়ে তোলা অসংখ্য রাজনৈতিক সংগঠনের মারফৎ। ভারতের বাইরেও কিছু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। সমাজের শি(িত এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষই এই সব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল, এই সব রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, পুনার সার্বজনিক সভা ও মাদ্রাজের মহাজন সভা।

কিন্তু এই সব রাজনৈতিক প্রতিষ্টানের কোন সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল না। সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থও তারা তুলে ধরে নি। এই অভাব পূর্ণ করতেই গড়ে উঠেছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। কেউ বলেছেন এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হিউম, কারও মতে ডাফরিন আবার কেউবা মনে করেন থিওজফিষ্টরাই এর প্রতিষ্ঠাতা। আবার অনেকে মনে করেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। আধুনিক মত অনুসারে কোন ব্যক্তি(বিশেষকে কংগ্রেসের স্থাপয়িতা হিসাবে চিহ্নি(ত করা যায় না।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েও নানা কথা উঠছে। হিউমের উপস্থিতি ও উদ্যোগ এই বিতর্কের মূলে। একটি মত অনুসারে হিউমের উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন এক গণ বিপ-বের হাত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে র(া করার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের এক শ্রেণীর জনগণকে হাত করা। কংগ্রেসকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন এক ''নিরাপত্তামূলক'' যন্ত্র হিসাবে। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই রজনীপাম দত্ত গড়ে তুলেছেন তাঁর চত্র(ান্ত বা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব তাঁর মতে সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্যই কংগ্রেসও এই ষড়যন্ত্র অংশীদার হয়েছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করেছেন।

কংগ্রেসের সামাজিক ভিত্তি নিয়েও নানা প্র(ন উঠেছে। কারও মতে কংগ্রেস ছিল বুর্জোয়াদের মুখপত্র। আবার কারও মতে তা ছিল জমিদার শ্রেণীর সংগঠন। আসলে কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় সমবেত হয়েছিল অনেকেই। তার মধ্যে জমিদার ও বণিকরাও ছিল। তবে কংগ্রেস ছিল মূলত শি(ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন। সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের সেখানে ঠাঁই হয় নি। মুসলিম সম্প্রদায়ও কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত(ছিল না। ব্যতিত্র(ম ছিলেন বদ(দ্দীন তায়েবজীর মত কিছু মানুষ।

১(ক).৮ অনুশীলনী

১. ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ শাসনের বি(দ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেন ুব্ধ ছিল?

২. ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতে যে সব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল, সেগুলি উল্লেখ করে দেখান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের কোথায় অমিল ছিল।ড়

৩. কংগ্রেসের উদ্ভব সম্পর্কে রজনীপাম দত্তের ''ষড়যন্ত্র তত্ত্ব'' আপনি কি যুক্তি(গ্রাহ্য বলে মনে করেন?

৪. আপনি কি মনে করেন যে কংগ্রেস ছিল মূলতঃ শি(ত ও মধবিত্ত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র?

৫. মুসলিম সম্প্রদায় কংগ্রেস যোগদান করতে অনিচ্ছুক ছিল কেন? আপনি কি মনে করেন এর জন্য সৈয়দ আহমেদ দায়ী ছিলেন?

১(ক).৯ গ্রন্থপঞ্জী

১. অমলেশ ত্রিপাঠী— স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

২. Bipan Chandra and Others—Indians struggle for Independence.

৩. সুমিত সরকার— আধুনিক ভারত

৪. অমলেশ ত্রিপাঠী, বিপান চন্দ্র ও ব(ন দে— স্বাধীনতা সংগ্রাম (Freedom struggle—N.B.T.)

৫. Anil Seal—Emergence of Indian Nationalism.